B.A. (General) Part-III

BENGALI (G)

Semester-V

DSE-1B : বাংলা কাব্য ও কবিতা

Unit-IV জীবনানন্দ দাশ - রূপসী বাংলা (নির্বাচিত কবিতা)

ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য কবি জীবনানন্দ-দাশের 'রূপসী বাংলা' (নির্বাচিত কবিতা) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি ....' কবিতাটির যে আলোচনা দেওয়া হল তা 'শীতল চৌধুরী'র 'রূপসী বাংলায় জীবনানন্দ: ধ্যানে-চেতনায়' (১ম প্রকাশ-জুন ২০০৪ / প্রজ্ঞা বিকাশ; প্রকাশনা) গ্রন্থ থেকে নেওয়া, এর জন্য লেখকের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। আর কবিতাটি 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার' (বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ-১৩৬ থেকে নেওয়া।

Scanned with CamScanner

বাংলায় তারে।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ঃ   অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েলপাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশথের ক'রে আছে চুপ ;

Scanned with CamScanner

ফনীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিলো ; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিলো, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিলো,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায় ।

যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া

Scanned with CamScanner

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ

১

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতাটি কবি জীবনানন্দ দাশের "রূপসী বাংলা" কাব্যগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এই কবিতাটির মধ্যে কবি-অন্তরের বাংলা প্রকৃতির প্রতি এক অগাধ নিখাদ ভালোবাসাদীপ্ত প্রেমের স্বতঃস্ফূর্তভাব ফুটে উঠেছে। যেখানে জননী ও জন্মভূমি সমান্তরালভাবে তাঁর পল্লীগ্রামের প্রীতির মধ্যে মিলেমিশে আছে। এ প্রীতি মূলত তাঁর অন্তরে প্রেয়সীরূপের প্রতিমূর্তিতে হাজির হয়েছে কিছুটা মাতৃভাবাপন্নতার আবহ নিয়ে। পুরনো দিনের বাংলার ঐতিহ্যকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে কবি এই কবিতাটিতে তাঁর দেশপ্রেম ও বাংলার প্রকৃতির প্রতি তাঁর চির আস্থার কথাও অকপটে ব্যক্ত করেছেন। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে এই কবিতাটির মধ্যে যে সত্যটি উঠে আসে তা হলো কবি অন্তরের বাংলাদেশের প্রতি প্রেমের অন্তরমথিত বিশালতা। যে বিশালতা এক অর্থে কবির কাছে একটি পৃথিবীর চেয়েও অধিক মূল্যবান বলে মনে হয়েছে। বাংলার মুখের মধ্যে তিনি যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সৌহার্দ্য খুঁজে পান তা একান্তই আপনার হৃদয়গত সমগ্রতার, পৃথিবীর রূপের মতোন তা কোনো জাদুকরী মোহিনীমায়ার নয়! কবিতাটির শুরুতেই কবি তা আমাদের স্পষ্ট করে দেন তাঁর স্বগত হৃদয়তাড়িত উচ্চারণে—

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর.....

আসলে 'মুখ' শব্দের মধ্যে কবি জীবনানন্দ যে সত্য-সুন্দরকে খুঁজে পান, তা তিনি 'রূপ'-এর মধ্যে পান না। 'রূপ' শব্দটি তাঁর কাছে যেন কেমন 'মেকি' এবং 'স্বতঃস্ফূর্তহীন একটা মোহিনীমায়ার আবরণ বলে মনে হয়। বলা ভালো, প্রাণহীন একটা পালিশ মাত্র। এ কারণেই সম্ভবত তাঁর কাছে রূপের চেয়ে মুখ বেশি অর্থবহ হয়ে উঠেছে তাঁর অনেক কবিতাতেই আমরা দেখি। 'মুখ'-এর মধ্যে যেন তিনি একটা সমগ্রতাকে খুঁজে পান। সমগ্রতার স্বাদ নেবার জন্যই বলা যায় তিনি পৃথিবীর রূপের মোহ ত্যাগ করে বাংলার মুখের দিকে তাকিয়ে মগ্নতায় ধ্যানস্থ হবার আকাঙ্ক্ষা করেন।

মাত্র চোদ্দ পংক্তির এই কবিতাটিতে রূপ-রস-গন্ধময় বাংলাকে কতটা গভীরভাবে ভালোবেসেছেন এবং ধ্যানে ও অনুধ্যানে কতটা মগ্নতায় আচ্ছন্ন হয়েছেন তাঁর হৃদয়তাড়িত উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রকরের মতোন তুলে ধরেছেন নিখুঁত বর্ণনায়। কবি যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের বলেন এ কথা—

অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েলপাখি—

আমরা পেয়ে যাই বাংলা প্রকৃতির মুখশ্রীর একটা পরিচয়। ভোরের উজ্জ্বল বর্ণনার মধ্যে যা চিত্রিত। আঁধার অবমান মুহূর্তের ফিকে আলোয় ভরা এক বাংলা প্রকৃতির ভোরের মুখশ্রী। যে মুখশ্রীর চিত্ররূপ এরকম—আঁধার অবসান মুহূর্তের এক ভোরে কেবল একটি দয়েল

Scanned with CamScanner

(পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে) পাখি ছাতার মতন বড়ো একটি ডুমুর গাছের পাতার নিচে বসে আছে। 'ছাতার মতন' কথাটির মধ্য দিয়ে কবি একদিকে যেমন বাংলা প্রকৃতির রূপমাধুর্যকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তেমনি একইসঙ্গে আশ্রয়দাত্রী মা রূপে হাজির করে বাংলা প্রকৃতির স্নেহময়ী স্নিগ্ধতার ছবিটি আমাদের কাছে হাজির করেছেন। বাংলা প্রকৃতির অঙ্গে যে কত মাদকতা, কত স্নেহছায়ার স্নিগ্ধতা তা এক এক করে নানান অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন খণ্ড খণ্ড চিত্র মালার মতন এক এক করে পর পর গেঁথে গেঁথে। আঁধার অবসানের ফিকে ভোরের রূপমুহূর্ত তুলে ধরার পর যখন তিনি আবার আমাদের বলেন এ কথা—

চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশথের ক'রে আছে চুপ ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;

বুঝতে বাকি থাকে না—বাংলা প্রকৃতির ঘুমভাঙা ভোরের মুহূর্তের নীরব ছবিটি কেমন, তা তিনি অকপটে তুলে ধরেছেন নিপুণ চিত্রকরের মতন। ভোরের মৃদু আলো যে কেবল আম-জাম-কাঁঠালের ছায়া ফণীমনসার ঝোপকে ছায়াময় করেছে তা নয়, একইসঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছে একটা রহস্য ও শান্তির ভাব। কবি কথাতেই যা স্পষ্ট।

কিন্তু এর পরেই যখন তিনি আমাদের বলেন এ কথা—
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিলো ; বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিলো, হায়,

বুঝতে অসুবিধা হয় না মনসামঙ্গল কাব্যের বণিক চাঁদসদাগরকে টেনে এনে বাঙালি পাঠকের মনোলোকে রূপসীবাংলার চিরন্তন অপরূপ ব্যাপারটিকে তুলে ধরেছেন। মধুকর ডিঙার চাঁদসদাগর এবং নারী বেহুলা মনসামঙ্গলের এই নরনারী মধ্যযুগের হলেও আজও আমাদের বাঙালির হৃদয়ে জীবন্ত, একইসঙ্গে মিথের মতোন আমাদের কল্পনার ভাবনালোকে বাস্তব সত্যের মতোন প্রতিষ্ঠিত। এই নরনারীর কথা তুলে ধরে বাংলার অপরূপ মূর্তিটিকেই জীবনানন্দ আসলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রার পথে 'তমালের নীল ছায়া'র কথা বলে তিনি আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন মধ্যযুগে বাংলার সৌন্দর্য যেমন চাঁদসদাগরের অন্তরকে যেমন প্রেমময় ও শান্তিময় করেছিল, তা আজও অক্ষুণ্ণ। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক তরুণ মুখোপাধ্যায়ের কটি কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। চাঁদসদাগর মিথটিকে জীবনানন্দের প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি" একটি শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন—'মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদসদাগর বণিক। অথচ তারও চোখে বাংলার রূপমাধুর্য ধরা পড়েছিল। মধ্যযুগের সেই ধূসর স্মৃতি টেনে এনে কবি একালের বাঙালি পাঠকের কাছে রূপসী বাংলাকে অপরূপা করে দেখাতে চেয়েছেন। চম্পকনগরী থেকে চাঁদের বাণিজ্যযাত্রার পথে "তমালের নীল ছায়া" কৃষ্ণের প্রেমের আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। বাঙালির "কানু ছাড়া গীত নাই" প্রবাদের কথা মনে রেখেই বুঝি শৈব চাঁদের যাত্রাপথে তমালের ছায়াপাত ঘটেছে।' যথার্থই বলেছেন তিনি (দ্র. কবি জীবনানন্দ : অনুভবে, অনুধ্যানে)

Scanned with CamScanner

কিন্তু এরপরেই বেহুলার গাঙুরের জলে ভেলা ভাসানোর কথা টেনে আনেন তখন আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না—কবি বাংলাপ্রকৃতির চিরন্তন এক শাশ্বত প্রেমের রূপটি আমাদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন বেহুলা ও লখিন্দরের অপরূপ প্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ তুলে। রাধা ও কৃষ্ণের মতোই এক অমোঘ অমরত্বপ্রেমের প্রতিরূপেই তিনি বেহুলা ও লখিন্দরের প্রেমকে যে একাসনে বসিয়েছেন তা তিনি আমাদের বেশ স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেন। এ জানানোর মধ্যে যে সত্যটি উঠে আসে তা হলো বাংলার প্রকৃতি আঁচলে লালিত জনমানসের প্রেম। বলা ভালো, রক্তমাংসের নরনারী, বর-বধূর প্রেম। এ কারণে তিনি বেহুলাকে শুধুমাত্র মনসামঙ্গলের নায়িকারূপে না দেখে তাঁকে তুলে ধরেছেন বাংলার প্রতিনিধিস্থানীয়া এক বধূরূপে। তাই তিনি বেহুলার ভেলার যাত্রাপথের বর্ণনায় বাংলা প্রকৃতির সৌন্দর্যের রূপ বিস্তার ঘটিয়েছেন কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্নায় নদীর চড়া পরা, সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ-বটগাছের শ্যামলতার কথা বলে। রক্তমাংসের নারীর মতই স্বামীহারা বেহুলার নিরুদ্দেশযাত্রার বিষাদের কথাও স্পষ্ট করেছেন বাংলার রূপ বিস্তারের সঙ্গে একটা 'হায়' শব্দ জুড়ে দিয়ে। কিন্তু বিষাদের মধ্যেও একাকী সতী বেহুলার চোখেও যে লেগেছিল কিছু মুগ্ধতা, কিছু সজীবতা তা কবি আমাদের জানিয়ে দেন। এই মুগ্ধতা ও সজীবতাই একাকী বেহুলাকে যুগিয়েছে সাহস এবং একইসঙ্গে তাঁকে করে তুলেছে অটল দৃঢ়সংকল্প মনের অধিকারী তা কবি আমাদের ঠারোঠোরে বুঝিয়ে দেন। এসবের কেন্দ্রমূলে রয়েছে কিন্তু বাংলার অপরূপা সজীব-চঞ্চল প্রকৃতি। কবি-কথাতেই যা স্পষ্ট ধরা পড়ে, বা নজরে আসে। বিশেষ করে কবি যখন বলেন আমাদের এ কথা—

শ্যামার নরম গান শুনেছিলো

এই একটি কথার মধ্যে পাওয়া যায় একদিকে স্বামীহারা বেহুলার অন্তরে মুগ্ধতার আবেশ, অপরদিকে একটা প্রাণচাঞ্চল্যের অমৃত বার্তার! যে বার্তার মধ্যে রয়েছে অমল আনন্দ ও সান্ত্বনা। শ্যামা পাখির কোমল গানের কথা এনে কবি বাংলার প্রকৃতির স্নেহময়ীর রূপটিকেই যেন আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরে বলতে চেয়েছেন এ কথা—বাংলার প্রকৃতি এমনই যে, সে শোকার্তের হৃদয়েও সঞ্চার করে সান্ত্বনা এবং বেঁচে-থাকার এক অমল আনন্দ। বলতে গেলে, এই বাংলা প্রকৃতির সজীবতাই যে স্বামীহারা বেহুলাকে অদম্যপ্রাণশক্তিতে ভরপুর করে তুলেছিল তা-ও কবি ইঙ্গিতবাহীভাবে আমাদের বুঝিয়ে দেন বাংলা প্রকৃতির চিত্রার্পিত রূপের ছবি তুলে ধরার পর শ্যামা পাখির কোমল গানের কথা বলে। প্রকৃতির মুগ্ধচিত্র ও সজীবতাই শেষমেষ বেহুলার হৃদয়ে এক প্রাণচাঞ্চল্যের ঢেউ তুলেছিল বলেই তিনি স্বামীর প্রাণ ফিরে পাবার জন্য দেবতাদের খুশি করতে ছিন্ন খঞ্জনার মতো সব পোষাকি-বন্ধন ছিন্ন করে ইন্দ্রসভায় নাচেন। কবি-কথায়—

একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়

তবে, 'ছিন্ন খঞ্জনা'র যন্ত্রণার কথা তুলে ধরে কবি স্বামীহারা বাংলার সতী নারীর হৃদয়ের ভেতরের তীব্র একাকীত্বের যন্ত্রণার কথাই ব্যক্ত করেছেন। এবং একইসঙ্গে ব্যক্ত করেছেন এক স্বামীহারা অসহায় নারীর দুঃখময় অবস্থার প্রতিচ্ছবি যা খঞ্জপাখির নাচের মতই যন্ত্রণাময়। কিন্তু এরপরেই যখন কবি আমাদের বলেন এ কথা—

বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়

Scanned with CamScanner

বুঝতে পারি, কবি বাংলার সতী নারীর সঙ্গে বাংলা প্রকৃতির রূপসৌন্দর্যের কোমলতাকে হাজির করেছেন বর্ণ-গন্ধ ও দৃশ্যরূপে। বেহুলার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষার জন্য যে ইন্দ্রসভায় দেবতাদের খুশি করতে 'ছিন্ন খঞ্জনা'র মতোন যন্ত্রণাময় নাচ— সে নাচের মধ্যে এমনই ছিল সজীবতা ও আনন্দ-মুগ্ধতা, যা 'বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল' এর মতোই প্রাণবন্ত। 'ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়' কথা কটির মধ্যে যন্ত্রণার তীব্র রূপ প্রকাশ পেলেও, এ যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে এক সান্ত্বনার বাণী। রূপমাধুরীর আবেশ দিয়ে কবি যা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। কাজেই, বাংলা প্রকৃতির চিত্রকে হাজির করে কবি বাংলা প্রকৃতিমায়ের কোমল মাধুর্যপূর্ণ প্রাণসত্তাময়ী স্নিগ্ধ প্রেমময়ী মূর্তিটিকেই ইঙ্গিতময়তায় তুলে ধরতে চেয়েছেন বলা যেতে পারে। যার প্রাণময় শ্বাস ছড়িয়ে আছে সদা-সর্বদা চিরন্তন হয়ে বেহুলার মতোনই মুগ্ধতায়, আবেশে ও দুঃখ-যন্ত্রণায়। যা আমরা কোনভাবে আমাদের চলমান জীবন থেকে কালপ্রবাহের যাত্রাপথে ছেঁটে ফেলে দিতে পারিনা। এ কারণেই বলা যেতে পারে কবি জীবনানন্দের কাছে বাংলাপ্রকৃতিই হলো জননী, জায়া ও জন্মভূমি রূপে এক অনন্ত ব্রহ্মময়ী হয়ে বিরাজিত। এ জন্যই তাঁর কাছে পৃথিবীর যে বর্হিরূপ তা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। পৃথিবীর রূপ দেখার বা খোঁজার তাই তিনি আগ্রহ হারান। কেননা প্রেমময়ী শাশ্বত যে রূপের তিনি সন্ধানী, তার খোঁজ তিনি যথার্থভাবেই পেয়ে গেছেন বাংলা প্রকৃতির ভালোবাসাদীপ্ত মুখের মধ্যে। যে মুখ জননী, জায়া ও জন্মভূমি রূপে এ অনন্ত ব্রহ্মময়ীর! কবিতাটির মূল বাণী এটিই বলা যেতে পারে।

২

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতাটি একটি সনেট কবিতা। পেত্রার্কীয় রীতির অনুসরণে রচিত হলেও কবিতাটি গড়ে উঠেছে শেক্সপীয়রীয় অন্ত্যমিলে শেক্সপীয়রীয় রীতিতে। যদিও তিনটি চতুষ্ক রচনার শর্ত কবিতাটিতে কবি আরোপ করেননি। বরং অষ্টক ও ষটক ভাগ স্পষ্ট করেছেন। ফলে, এই সনেটটিকে জীবনানন্দীয় সনেট রূপে গ্রাহ্য করা যেতে পারে। ষট্‌কের শেষে পংক্তি দুটিকে সমিল করে তিনি কিন্তু স্বকীয়তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন—

ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো করে কেঁদেছিল পায়।

আর একটা জিনিস চোখে পড়ে, তা হলো ক্রিয়াপদের আধিক্য। যেটি জীবনানন্দের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য। যা এই সনেটটিতে নজরে আসে। যেমন—দেখেছিলো, চেয়ে দেখি, পড়িয়াছে, শুনেছিল, নেচেছিলো, কেঁদেছিলো ইত্যাদি। দৃষ্টিনন্দন অলঙ্কার ও চিত্রকল্পেও সৌন্দর্যময় হয়ে উঠেছে এই সনেট কবিতাটি। 'ছাতার মতন' বা 'ছিন্নখঞ্জনার মতো' নিপুণ উপমার পাশে সমাসোক্তি অলঙ্কারের ব্যবহার কবিতাটিকে এক আলাদা মাত্রা দিয়েছে। পাঠকের হৃদয়ে রসসঞ্চার করেছে বলা যায়। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে এই কবিতাটিকে জীবনানন্দের বাংলা প্রকৃতির এক সত্য ও সুন্দরের প্রকৃত আলেখ্য বলা যেতে পারে। যা একান্তই কবি-হৃদয়ের মর্মবাণীরূপে উদ্ভাসিত।

Scanned with CamScanner